খ্রিস্ট ধর্ম ও মৃত্যু

সিদ্ধার্থ বিশ্বাস

কোনোদিন জাগিবে না আর
জানিবার গাঢ় বেদনার
অবিরাম - অবিরাম ভার
সহিবে না আর

before I go to the place of no return
to the land of gloom and deep shadow,
to the land deepest night,
of deep shadw and disorder,
where even the light is darkness.

জীবনানন্দ দাশ, 'আট বছর আগের একদিন) (Job 10-21-22)

দর্শন, সাহিত্য, ধর্ম, বিজ্ঞান—প্রতিটি ধারার প্রান্তিক প্রতীক তথা বাস্তব মৃত্যু। জীবনের চরমতম সত্য বলে পরিচিতঘাপটি মেরে প্রত্যেকের জীবনের আনাচে কানাচে বসে থাকে। বলে, না বলে, অজান্তে উদয় হয় সে, কেউ কেউ রাবীন্দ্রিক চেতনায় তার বাহুপাশকে অভ্যর্থনা জানিয়ে জেগে উঠতে পারেন, কেউ কেউ শিহরিত হয়ে লক্ষ্য করেন কেমন করে চিলের নখরার মত ধারালো হয়ে মৃত্যু চিরে দেয় মেঠো ইঁদুরের স্বপ্নকে। আর বাকিরা, বেশিরা ভুলে থাকেন যে একদিন ফুরিয়ে যাবে সব প্রতীক্ষা আর গোডোরূপী যম এসে নিয়ে যাবে বৈতরণী পার। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

মানব জীবন ও মৃত্যুকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে, এই দুইয়ের মধ্যে একের মিল দেখে না। যেমন তার দেহে পিঠের দিকে চোখ নেই বলে কেবল সামনের অঙ্গকেই মেনে নেওয়া ভীষণ ভুল, তেমনি জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে আপাত - অনৈক্যকে সত্য বলে জানালে জীবনকে খণ্ডিত করে দেখা হয়।

(চরিত্রপূজা, 'খ্রীষ্টোৎসব')

অন্যদিকে এঙ্গেলস্ লিখেছেন,

the negation of life as being is essentially contained in life itself, so that life is always thought of in relation to its necessary result, death, which is always contained in it in germ

(Dialectics of Nature)

ধর্ম অন্য কথা বলে। হ্যামলেট -এর মর্মবাণী— মৃত্যু সেই অনাবিষ্কৃত দেশ যার সীমানা থেকে কোন পথিকের প্রত্যাবর্তন হয় না— অনস্বীকার্য।

নৃতত্ত্ববিদরা হয়ত বলতে পারবেন ধর্মের সৃষ্টি কীভাবে, কেন। কারণাবলি যাই হোক না কেন, বর্তমান লেখকের দৃঢ় বিশ্বাস ধর্মসৃষ্টির পিছনে অন্যতম কারণ মানুষের মৃত্যুচিন্তা। প্রকৃতির বহু দুর্বোধ্য খেয়ালের মধ্যে আদিম মানবের কাছে দেহের জড়ীকরণ ছিল এক অদ্ভুত সমস্যা। প্রাকৃতিক অন্যান্য সব কিছুর মতো চক্রাবর্তনের আশা— যেখানে জীবন মৃত্যু একে অপরের পরিপূরক এবং দেহধারণ হয়ত তাদের অমরত্বের কল্পনার সূত্রপাত করে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ধারণা বুদ্ধিমত্তার উন্নতি তথা জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, হয়ত কৃত্রিমতা প্রেম বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, ধর্মবোধ/ ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে মৃত্যুচেতনারও। সরল প্রকৃতিগত ধারণার বদলে এসেছে চিরন্তন অসীম ত্রিভুবনেশ্বরের মনশ্ছবি। এর সঙ্গে সঙ্গে এসেছে পুরস্কার ও শাস্তির অনুমান। প্রাণের জটিলতা উপলব্ধি নিয়ে এসেছে সান্ত্বনার সন্তান। আলোচনাতে 'মৃত্যু' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

ধর্মকে আশ্রয় করিলে মৃত্যুভয় থাকে না। এখানে মৃত্যু অর্থে ধ্বংস নহে, মৃত্যু অর্থে জড়তা। অবচেতনতাই অধর্ম। ধর্মকে যতই আশ্রয় করিতে থাকিবে, ততই চেতনা লাভ করিতে থাকিবে, ততই অনুভব করিতে থাকিবে, যে মহাচৈতন্য সমস্ত চরাচর অনুপ্রাণিত হইয়াছে, আমার মধ্য দিয়া এবং আমাকে প্লাবিত করিয়া সেই চৈতন্যের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে।

মৃত্যুর সংজ্ঞা খুঁজতে গেলে বহুমত, বহুপথ সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। কোনো স্বতন্ত্র জীবসত্ত্বার ক্রিয়াবলীর অবসান ঘটাকে বৈজ্ঞানিক মৃত্যু বলা যেতে পারে। ধর্ম অবশ্য একমত হবে না। ধর্ম বিশ্বাস অনুযায়ী এই ঘটনা জৈবসত্ত্বা বা দেহ নামক যন্ত্রটির অন্ত মাত্র। কিন্তু মানুষ কেবল দেহ নয়, আরও বেশি কিছু। যাবতীয় ধর্মই বিশ্বাস করে জন্মের আগের ঐশ্বরিক এক অস্তিত্বে, জন্মের পর 'আত্মা' সেই অবস্থার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দেহে প্রবেশ করে, এবং মৃত্যুর পর তা সরাসরি বা নানাপথে আবার ঈশ্বরে বিলীন হয়ে যায়। বিজ্ঞান ও ধর্মের বিরোধ এখানেই, বিজ্ঞান মনে করে মৃত্যু প্রাকৃতিক ও চূড়ান্ত, ধর্ম মনে করে মৃত্যু অতিপ্রাকৃতিক ও ভিন্ন এক বিদ্যমানতার পথ। বহু ধর্ম জীবনকেও মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাহ্য করে।

ইসলাম, হিন্দুধর্ম বা বৌদ্ধধর্ম থেকে খ্রিস্ট ধর্মে মৃত্যুচিন্তা অনেকটাই অন্যরকম। খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টধর্মগ্রন্থ উভয়ের ভিত্তিপ্রস্তরই হল এক ঐশ্বারিক ব্যক্তিত্বের মৃত্যু। পুনরুজ্জীবন/ পুনরুত্থান মানবিক শরীরের অবসানের পরেই সম্ভব। জিশুখ্রিস্টের দৈবত্বের সমস্যা এখানে নেই কারণ বাইবেল কথিত 'Son of man' বা মানবসন্তানের মৃত্যুই খ্রিস্টধর্মের মূলমন্ত্র হিসেবে থেকে যায়। সংগঠিত প্রাতিষ্ঠানিক কর্মরীতি এবং তত্ত্ব দুই ক্ষেত্রেই ক্রুশবিশুদ্ধকরণ মূলকথা।

হিন্দুধর্ম যেহেতু পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে তাই মৃত্যু এখানে চূড়ান্ত মাহাত্ম্য পায় না। গীতা অনুযায়ী মৃত্যু পোষাক পরিবর্তনের অনুরূপ এবং মৃত্যুর পর আত্মা ও চেতনার এক ক্ষুদ্রাংশ দেহত্যাগ করে। এরপর দুদিকে তার যাত্রার সম্ভাবনা, যদি সে সূর্যের দিকে যায় তাহলে পরমাত্মার সঙ্গে মিলন— মোক্ষলাভ হয়, যদি চন্দ্রের দিকে যায় তাহলে আবার তাকে পার্থিব জগতে ফিরতে হয়। এই 'ক্রিয়ায় পাপ - পূণ্যের হিসাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নশ্বরদেহ আত্মাহীন হওয়ার পর তার আর প্রয়োজনীয়তা থাকে না, তাই হিন্দুমতে সৎকার হওয়া আগুনের প্রয়োগে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে মুখাগ্নি হিন্দু সৎকাররীতির এক জরুরি অংশ যদিও কেউ কেউ বলেন যে কথাটার উৎপত্তি 'সমুখ্য আগ্নিক' বা অনুষ্ঠানের যিনি কর্ণধার তাঁর থেকে, মুখে আগুন দেওয়ার ব্যবস্থা থেকে নয়। শ্রদ্ধানুঅনুষ্ঠান বিভিন্ন ধর্মের থেকে আলাদা হলেও অশৌচ প্রথা, খাওয়ার বিধিনিষেধ বাদ দিয়ে সর্বজনীন।

বৌদ্ধধর্মে মৃত্যুচিন্তা অত্যন্ত জরুরি কারণ মৃত্যুর চেতনাই রাজকুমার সিদ্ধার্থকে তপস্যা করতে অনুপ্রাণিত করে। বৌদ্ধধর্ম মৃত্যুকে দেখে শরীরের বন্ধন থেকে মুক্তি হিসেবে— আত্মার বিবর্তন হিসাবে। কেউ কেউ মৃত্যুকে মোমের আলোর সঙ্গে তুলনা করেন। মোমবাতির আগুন নিজে নিভে গেলেও অন্য মোমে আগুন জ্বালাতে সক্ষম। একক মোমবাতি নিভে গেলেও আলো বজায় থাকে। এই ধর্মে মৃত্যুর সময় মানুষের মানসিক অবস্থা গূঢ়ার্থব্যঞ্জক এবং সারা জীবনের কর্ম ও চিন্তা পরবর্তী জীবনের ধরনকে নিশ্চিন্ত

করে। মৃত্যু এখানে পরবর্তী সত্ত্বাতে পরিবর্তনের পন্থামাত্র।

ইসলাম ধর্মে পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে না। মৃত্যুর আগমন অবশ্যম্ভাবী হলে এই ধর্মের মানুষ আল্লাহ-র হাতে নিজেকে সমর্পণ করেন। পরিবার পরিজন প্রার্থনার মাধ্যমে তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করেন। কবর দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয় তাড়াতাড়ি। সৎকার অনুষ্ঠান সমবেত প্রার্থনা বেহেস্ত-এর পথ প্রশস্ত করে। দেহের ডানদিক মক্কামুখী করে দেহকে কবরে দেওয়া হয়। বিশুদ্ধতা এই ধর্মে সবচেয়ে জরুরি।

ইহুদিধর্ম মনে করে মৃত্যুর উপযোগী জীবনকে মূল্যবান ও অর্থপূর্ণ করে তোলে। মৃত্যুভয় মানুষের বিবেক তথা পরবর্তী পর্যায়ের প্রস্তুতিতে অর্থাৎ ভয় দিয়ে ভালো - মন্দ বিচারের ক্ষমতাকে জোরদার করে তালে। ঈশ্বর ক্ষমাশীল হলেও ন্যায়পরায়ণ, সুতরাং অন্যায় কাজ করা পরবর্তী অধ্যায়কে কষ্টকর করে তোলবার পথ। এই প্রসঙ্গে স্বর্গ - নরক - এর ধারণাকে বহু তাত্ত্বিক ঈশ্বরের নিকটের বা দূরের অবস্থান দিয়েও ব্যাখ্যা করেন। আর স্বর্গলাভ করবার অধিকার তাঁদেরই আছে যাঁরা ধার্মিক জীবনযাপন করেন— ইহুদি না হলেও। সুতরাং মৃত্যু এখানে জীবনের কার্যাবলির শাস্তি/পুরস্কার রূপের প্রস্তুতি, আত্মার বিচরণের স্থান নির্ধারণের ব্যবস্থা।

সব ধর্মেই– পুনর্জন্মের কথা থাক বা না থাক– গ্রিক ধারণা বর্তমান যে আত্মা অবিনশ্বর, দেহ নশ্বর। মানুষ বা মানব - অস্তিত্ব বলতে আমরা দেহের কথাই বুঝি এবং আত্মা দেহনির্ভর নয়। আলোচিত মৃত্যু চেতনাগুলিতে জাগতিক ও অতিজাগতিক অবস্থানে দেহের গুরুত্বের হ্রাসপ্রাপ্তি কৌতুহলোদ্দীপক, যদিও আলোচনা সময়ানুক্রম মেনে হয়নি, তবুও বয়সানুযায়ী বিচার করলে দেখা যাবে যে মৃত্যুচেতনায় সবচেয়ে পুরানো এবং এখনও বর্তমান ধর্ম সহনশীল, আর নবতম ধর্ম সর্বাধিক কঠোর। খ্রিস্টধর্ম অবশ্য সবচেয়ে প্রাচীন বা নবীন কোনোটাই নয়, কিন্তু সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে এই মুহূর্তে পৃথিবীতে খ্রিস্টধর্মের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। পৃথিবীতে খ্রিস্টধর্মালম্বীদের সংখ্যা এখন আনুমানিক ১০০ মিলিয়ন (www.inplainsite.org/html/gfa_gospel_for_asia.thml)। আর আমরা যদি ঐতিহাসিক বিচারে ধরে নিই যে ইহুদিধর্ম আর খ্রিস্টধর্ম সম্পর্ক পিতা- পুত্রের, জিশুখ্রিস্টকে ইহুদিদের 'মেসায়াহ্' বা উদ্ধারকারী আর রাজা বলেই রোমানরা চিহ্নিত করেছিল, তাহলে একটি অদ্ভুত তফাৎ চোখে পড়বে। আত্মার অমরত্বের কথা ওল্ড টেস্টমেন্ট সেইভাবে কখনই বলে না।

বাইবেল -এ মৃত্যুর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ইডেন উদ্যানে, যখন ঈশ্বর প্রথম আদমকে জ্ঞানবৃক্ষ দেখিয়ে বলেন,

but you must not eat from the tree of knowledge of good and evil, for when you eat of it you will surely die. (Genesis 2:17)

বোঝা মুশকিল নয় যে জ্ঞানবৃক্ষের ফলে মানুষর জীবনে মৃত্যু নেমে আসে। ঈশ্বরের এই সাবধানবাণী থেকে বোঝা যায় মানুষ প্রথম মৃত্যুর জন্য তৈরি হয়নি। জৈব মৃত্যুর প্রথম উদাহরণ অবশ্য আসে পরে, যখন এবেল নিহত হয় তাই ভাই কেইন -এর হাতে আরও অজস্র উদাহরণ দেখায় যে মৃত্যু এখানে সম্পূর্ণ। বাইবেল বিভিন্ন জায়গায় এ বিষয়ে পাওয়া যায় ঃ

When their spirit departs, that return to the ground (Psalm 146.6)

and the dust returns to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it. (Ecclesiastes 12 :7)

Like water spilled on the ground, which cannot be recovered, so we must die, But God does not take away life; instead, he devises ways so that a Banished person may not remain estranged from him. (2 samuel 14 :14)

মৃত্যুর সম্পর্কেও আরও গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পাওয়া যায় ঃ

When Calamity comes, The Wicked are brought down, but even in death the righteous have a refuge. (Proverb 13:32)

আর, he will swallow up death for ever. The Sovereing Lord will wipe away the tears from all faces. (Isaiah, 25:8)

বাইবেলে মৃত্যুকে ভগবানের দূত হিসেবেও দেখা হয়েছে। বলা হয়েছে মৃত্যুর নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই—সে তার চিহ্নিত কাজ ছাড়া কিছু করতে পারে না।

Devid looked up and saw the angel of the Lord standing between heaven and earth, with a drawn sword in his hand extended over Jerusalem. (I Chronicle 21 :16)

তবে মৃত্যুদূত সম্পর্কে বাইবেল যত না বলে তার চাইতে বেশি বলে অ্যাপোক্রিফা (বাইবেলের আদি হিব্রু রচনার অনুপস্থিত অপ্রামাণিক অংশাবলি)।

বাইবেলের দ্বিতীয়ার্ধে বলা হয়, নিউ টেস্টামেন্ট-এ, যা খ্রিস্টার্ধমাবলম্বীদের মূল আধার, মৃত্যু জৈব দেহের পরিণতি এবং আত্মার মুক্তির পথ। সুতরাং মৃত্যু এখানে অন্য মাত্রা পায়। এই ঘটনাটির নিজস্ব গুরুত্ব যত না, তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এর প্রতিক্রিয়া/ প্রতিনিনাদ। মৃত্যুর সময়ে মানুষের সারা জীবনের কার্যকলাপ, সে জিশুখ্রিস্টের শরণাপন্ন হয়েছে কিনা, তার পাপের ভার যাবতীয় উপাদান স্থির করে তার আত্মা স্বর্গে যাবে না নরকে যাবে। খ্রিস্টধর্মের বিভিন্ন গোষ্ঠী এ ব্যাপারে বিভিন্নমত পোষণ করে। তবে ব্যক্তিগতভাবে প্রভু জিশুকে আহ্বান জানিয়ে পাপমুক্তর প্রার্তনাই হল সবচেয়ে জনপ্রিয় পন্থা। এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য চরম মুক্তি, পার্থিব জগ ? ও নরক থেকে, এবং বিশ্বাত্মা ঈশ্বরের সঙ্গে চিরন্তন মিলন।

প্রসঙ্গত নরকম সম্পর্কে নানা প্রকারের তত্ত্ব পাওয়া যায়। সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় যে বিশ্বাস তা হল নরক ঈশ্বরের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি ছাড়া এবং এটি দারণার জগতের একটি স্থান। নরকের বস্তু বা ভৌতজাগতিক অস্তিত্ব— সেখানে যন্ত্রণা অপরিসীম নিয়ে অনেকেই সন্তুষ্ট থাকেন, কিন্তু আত্মিক হতাশার যে স্বচ্ছ - শীতল - নিখাদ যে আতঙ্ক তা আরও ভয়াবহ। দ্বিতীয় জীবনের সম্ভাবনা যেখানে শূন্য সেখানে মৃত্যুধারণা ও নরকধারণা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হবেই। জিশুখ্রিস্টের সঙ্গে প্রতিটি আত্মার বিবাহের রূপক পরমাত্মার সঙ্গে মিলনের ধার্মিক রূপান্তর হিসেবে দেখা যেতে পারে। কিছু তাত্ত্বিকের মতে স্বর্গেও পুরস্কারের রকমফের আছে। কিন্তু বাইবেল অন্য কথা বলে। জিশুর প্যারাবেল বা নীতিমূলক কাহিনির মধ্যে অন্যতম হল আঙুরখেতের শ্রমিকদের কথা। ম্যাথিউ ২০:১-১৬ -তে বর্ণিত গল্প বলে যে দিনের শুরু থেকে যারা কাজ করছে এবং যারা সারাদিন কাজ পায়নি, দিনের শেষাংশে খেতের কাজে যোগ দিয়েছে তাদের সকলের পাওনা এক। এর সঙ্গে নরমপন্থীরা এও বিশ্বাস করেন যে যারা ঈশ্বরের বাণী শোনবার সুযোগ পায়নি তাদের প্রতিও ঈশ্বর ক্ষমাশীল হবেন। যে ধর্মেরই মানুষ হোন না কেন যাঁরা আত্মত্যাগ করেন তাঁদের জন্য দৈব আশীর্বাদ সব সময়েই আছে। ম্যাথিউ ২৫ ঃ ৪৬ বলে, যারা পাপিষ্ঠ তারা মৃত্যুর পর নরকে যাবে।

মৃত্যু সম্পর্কে জিশুর বার্তাবাহক পল - এর উক্তি তাৎপর্যপূর্ণ,

I declare to you, brothers, that flesh and blood cannot inherit the Kingdom of Good, nor does the perishable inherit the impershable. Listen, I will tell you a mystery: We will not all sleep, but we will all be changed in a flash, in the twinling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound. the dead will be raised imperishable, and we will be changed. For the pershable must clothe itself with the imperishable, and the mortal with immortality. When the perishabble has been clothed with the impershable, and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true ` "Death has been Swallowed up in victory." (1 Corinthians 15:50:54)

এর পরেও উল্লেখ পাওয়া যায় দ্বিতীয় মৃত্যুর যা আসবে রিভিলেশন বর্ণিত শেষ বিচারের দিনে— যেদিন সব খ্রিস্টধর্মাবলম্বীকে কবর থেকে উঠে চূড়ান্ত বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। যাদের শাস্তি অশেষ তাদের সেদিন এই মৃত্যুর হাত ধরে নরকের দিকে চলে যেতে হবে।

দুই স্টেস্টামেন্ট-এ উল্লেখযোগ্য তফাৎ হল যে প্রথমটি মৃত্যুকে অন্তিম ও নিরাশ বলে মনে করে, দ্বিতীয় অংশ মৃত্যুকে নবরূপায়নের পথ বলে মনে করে। যার ফলে খ্রিস্টধর্ম প্রার্থনা, স্তোত্র, পরগম্বরদের জীবনা— সব কিছুর মাধ্যমে এমন এক বাণী প্রচার করে যা মৃতুকে জয় করার আশা, প্রতিশ্রুতি বহন করে। কৌতূহলউদ্দীপক ব্যাপার এই হল যে দুই অংশের এই পার্থক্যের সঙ্গে সঙ্গে দুই ধর্মের সমাধি দেওয়ার প্রক্রিয়াও এই পার্থক্য বহন করে। প্রাচীনকালে মানুষের জীবন ছিল সামান্য সময়ের। খরা, বন্যা, মহামারি, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির নিরন্তর আক্রমণে, চিকিৎসাবিজ্ঞানের, আইনের, অধিকারের অভাবে মানুষের নিত্যসঙ্গী ছিল মৃত্যু। বিউবনিক প্লেগ জাতীয় অসুখ তখন ভয়াবহ ও ব্যাখ্যাতীত ছিল। ফলে এ সময় বিশ্বাস করা হত অসময়ের মৃত্যু আসলে ভগবান প্রদত্ত শাস্তি। পুরাকালের ইহুদিরা তাদের সৎকার প্রথা তৈরি করে এই ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে। মৃতদেহ তাড়াতাড়ি করব দেওয়া ছিল জরুরি তার একটা কারণ ছিল মধ্যপ্রাচ্যের সূর্য; তাছাড়াও প্রেতাত্মাকে অসন্তুষ্ট করবার আদি ভয়ও ছিল অন্যতম কারণ। মৃত্যুর পর পরিবার যে রীতি পালন করত তা মোটমুটি মেসোপটেমিয়ার সংস্কৃতি থেকে নেওয়া। মৃতদেহকে পরিষ্কার করে তাতে নানা রকমের সুগন্ধি তেল, আতর দেওয়া হত, আরও কিছু সুগন্ধি মশলা শবাচ্ছাদন ও দেহের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হত। মৃতদেহের সঙ্গে সৎকারক্ষেত্রর পর্যন্ত যাওয়াটা পূণ্য মনে করা হত। মৃতের প্রতি সম্মান জানানো ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। যদিও শ্রদ্ধাও বা ভালোবাসার ব্যক্তির দেহাবসান ঘটে গেছে তবু এ জগতে তার পরিচায়ক আধারকে অশ্রুদ্ধা অনুচিত এখনো মনে করা হয়। খ্রিস্টধর্মের রীতিনীতি অদলবদল হয় বিভিন্ন সম্প্রদায় অনুযায়ী। কিছু ক্ষেত্রে মৃত্যুর সময়ে ধর্মযাজক মৃতপ্রায় ব্যক্তির পাশে এসে প্রার্থনা করেন। রোমান ক্যাথলিক হলে দেহকে পবিত্র তেল দিয়ে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করা হয় অনেক সময়। মৃত্যুর পর দেহটিকে কফিনে রাখা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কফিনের ঢাকনা খোলা থাকে যাতে আত্মীয়পরিজন শেষ দেখা করতে পারে। চার্চে বা চ্যাপেলে মরদেহ রেখে বাইবেল পাঠ ও উপাসনা চলে এবং আত্মার শান্তি ও স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হয়। রোমান ক্যাথলিকরা একটি বিশেষ ইউক্যারিস্ট (যে প্রথায় জিশুর তিরোধান উপলক্ষে রুটি ও মদ, যা জিশুর মাংস ও রক্তের প্রতীক, খাওয়া হয়) পালন করে যাতে Requiem Mass বা সমবেদ স্তবসঙ্গীত - উপাসনা হয়। তারপর কবরখানা বা দাহস্থলে যাওয়া হয়। আরও প্রার্থনার পর দেহটিকে শেষ বিদায় জানান হয়। আগে দাহ করা প্রথা অপছন্দ করা হবত, কারণ এই ব্যবস্থায় সমাধিফলক বা স্মৃতিচিহ্নের কোনো অবকাশ থাকে না। যিনি পৌরোহিত্য করেন তিনি এই অনুষ্ঠানে বলেন—

We commit this body to the ground, earth to earth, ashes to ashes, dust to dust.

মানুষকে মনে করিয়ে দেওয়া হয় যে নশ্বর দেহ আর আত্মা ভিন্ন। মৃত্যু যতটা দুঃখের ততটাই আনন্দের যে জৈব কষ্টের থেকে আত্মা মুক্তি পেয়ে ঈশ্বরের কাছে ফিরে যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ চরিত্রপূজা-তে খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে লিখেছেন যে 'অন্তর্যামী নিয়ন্তা' ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ 'মৃত্যুশোকের উপর আনন্দধারা প্রবাহিত করছে'। কবরে ফুল দেওয়া প্রথা নতুন অস্তিত্বের প্রতীক। বলা হয় কবরে দেওয়া মোমবাতি জিশুখ্রিস্টকে সূচিত করে, কারণ তিনি অন্ধকার জগতে আলো নিয়ে এসেছিলেন। খ্রিস্টধর্মাবলম্বীরা মানেন যে একটাই জীবন পাওয়া যায় আত্মার শুদ্ধি তথা মুক্তির জন্য। তাই এই জীবনের গুরুত্ব অপরিসীম। তবে মধ্যযুগীয় কঠোর আত্মসংযমী অনাড়ম্বর জীবনের ধারণা নবজাগরণের পর থেকে বদলে যায়। জাগতিক জীবনের গুরুত্ব কেবলমাত্র পরবর্তী অস্তিত্বের প্রস্তুতির জন্য—এই বিশ্বাস পরিবর্তিত হয়। অবশ্য ফ্রান্সিস বেকন তার 'Of Death' -এ বলেছেন পাপের শাস্তি মৃত্যু এ বিষয়ে চিন্তা করা স্বাস্থ্যকর। তাঁর লেখাতেই মৃত্যুভয়কে শিশুদের অন্ধকারের ভয়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

যদিও খ্রিস্টধর্ম সরাসরি বলিদানে বিশ্বাস করে না। কিন্তু এই ধর্মের মূলে রয়েছে জিশুখ্রিস্টের আত্মবলিদান। তাঁর মৃত্যুর আগেই সঙ্গীদের সঙ্গে 'অন্তিম ভোজন' -এ তিনি তাঁর ভাগের রুটি ও মদ বিতরণ করেন তাঁর মাংস ও রক্তের প্রতীক হিসেবে (transubstantiaton বা রূপান্তর প্রক্রিয়া) ইউক্যারিস্ট -এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। ধরা পরবার আগে জিশু অনুগামীদের বলেন,

And he look bread, gave thanks and broke it, and gave it to them, saying, "This is my body given from you : do this in remembrance of me."

In the same way, after the supper he look the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you," (Link 22:19:20)

যাবতীয় ধর্মের বলিদান প্রথা মত এখানেও বলির উপাদান সমানভাবে ভাগ করে ভোগ/ ভোজন/ ব্যবহারের ফলে সোধন সম্ভব হয়। প্রথাগত স্বজাতিভক্ষণের এই ব্যাপার বহু খ্রিস্টধর্মাবলম্বীর কাছেও হয়ত স্পষ্ট নয়। বলিদান - প্রথা বাদ দিয়ে ভাবলে দেখা যাবে মৃত্যুর উপর জয়লাভ করাই খ্রিস্টধর্মের মূল বক্তব্য। জিশুর পুনরুত্থানও স্বর্গযাত্রাকে এই দাবির সাক্ষ্য হিসেবে দেখা হয়। এই ধর্মে মৃত্যু কেবলমাত্র পরিবর্তনের একটি পন্থা— ঈশ্বরের থেকে আগত আত্মা যা দেহ নামক কয়েকখানায় আবদ্ধ তার মুক্তি পাওয়ার উপায়। তাই খ্রিস্টধর্মাবলম্বীর জীবনের মূলমন্ত্র পাওয়া স্তোত তেইশে (Psalm 23, Psalm of David)

Yes, though I walk through the valley of the
shadow of death; I will through the valley of the
art with me; thy rad and thy staff they
comfort me.